ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় :-

কোচবিহার রাজ সভায় বিদ্বৎজন সমাবেশের ঐতিহ্য, রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষিতা, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট সাহিত্যের (১৩শ শতকের প্রারম্ভ থেকে ১৭শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত) পরিচয় ।

সমাজতত্ত্ববিদ্ Schucking এর মতে, অতীত কালের সাহিত্যের ইতিহাস মূলত রাজা- রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস । (The Sociology of Literery Test-L.L.Schucking, Chapter-II) । সত্যই তখনো সাহিত্য জনসাধারণের রুচিবোধ উৎসাহ ও প্রশংসার উত্তাপে গড়ে উঠবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারেনি । তাই কবিরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার প্রত্যাশী হয়েই থাকতেন । উল্লেখযোগ্য এই যে বাংলা সাহিত্যে রাজানুকূল্যের সূচনা হয়েছিল কোচবিহার রাজ দরবারে । প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যানুরাগী কোচ রাজারা বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতদের আহ্বান করে কোচবিহারে এনেছেন এবং তাঁদের দিয়ে নানাবিধ সাহিত্য রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ধারাকে পুষ্ট করেছেন । কোন কোন রাজা নিজেও সাহিত্য সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছেন ।

বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত কোচবিহার রাজবংশের রাজত্ব শুরু হবার পূর্বে করতোয়া থেকে বড়নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে যে কামতা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার রাজা ছিলেন দুর্লভনারায়ণ । ত্রয়োদশ শতাব্দীর এই রাজার দরবার পণ্ডিত, আচার্য ও কবি মণ্ডিত ছিল । (আসামিজ লিটারেচার, হেম বড়ুয়া, পৃ ৩২, ১৯৬৫)

গেইট সাহেবের মতে 'প্রহ্লাদ চরিত'' অথবা'' বামন পুরাণ''রচয়িতা হেম সরস্বতীর সঙ্গে দুর্লভ নারায়ণের সখ্যমূলক সম্পর্ক ছিল । ঐ সময়ে তিনি পুরাণের অনুবাদ করে ধর্মজ্ঞানের প্রবক্তার ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন ।' প্রহ্লাদ চরিত' গ্রন্থ কবি হেম সরস্বতী আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে পৃষ্ঠপোষক নরপতির প্রশস্তি করেছেন এইভাবে -

কমতা মণ্ডল দুর্লভনারা(য়)ণ নৃপবর অনুপাম ।
তাহান রাজত রুদ্র সরস্বতী দেবযানী কন্যা নাম ।।
তাহান তনয় হেম সরস্বতী ধ্রুবর অনুজ ভাই ।
পদ বন্ধে তেহো প্রচার করিলা বামণ পুরাণ চাই ।।

হেম সরস্বতী বৈষ্ণব - পূর্ববর্তী যুগে' প্রহ্লাদ'চরিত ' রচনা করেন । এখানে দেখতে পাই [illegible] ভক্তি বাদের বিন্যাস । দৈত্য হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে বৈষ্ণব পুত্র প্রহ্লাদের মানসিক দ্বন্দ্বের

বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ঐ গ্রন্থে। দেখা যায় হিরণ্যকশিপু ও হরির প্রতি শ্রদ্ধা বিনম্র সুরে কথা বলছেন যা একান্ত অভিনব -

নমো নারায়ণ প্রভু দেব যদুপতি।

তোমার কারণে মোর থাকুক ভকতি ।। (লিটারেচার ইন কামতা কোচ রাজ দরবার, ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তী, ৪ পৃষ্ঠায় উধৃত)

'প্রহ্লাদ চরিত' থেকে কবি হেম সরস্বতীর বৈষ্ণব ভাবুকতার জ্বলন্ত প্রমাণ পেলেও আমরা 'হরগৌরী সংবাদ' কবিতা গ্রন্থখানির মাধ্যমে তাঁর কবি প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পেতে পারি। এখানে তাঁর শৈব ও শাক্ত অনুরাগের পূর্বসূত্র পাওয়া যায়। তিনি ব্যাপক ভাবে দুলাড়ি ছন্দ প্রয়োগ করেছেন। পরবর্তী কালে শঙ্করদেব ও মাধবদেব এই ছন্দের সুন্দর ব্যবহার করেছেন। 'প্রহ্লাদ চরিতে' প্রকৃত ধারার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। তাঁর বর্ণনা ধর্মী রচনা কুশলতা মৌলিকতা দাবী করে। (আসামিজ লিটারেচার-হেম বড়ুয়া, পৃঃ ৩৩) অপর দিকে হেম সরস্বতী সম্বন্ধে ডঃ মহেশ্বর নেওগ ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর বিচারে হেম সরস্বতীর বর্ণনা চিত্তাকর্ষক নয়। তাঁর ভাষা ও রচনা শৈলী উচ্চাঙ্গের নয়। ছন্দ গতানুগতিক, অন্ত্যানুপ্রাস সব সময় সুখকর নয়। (অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা, পৃঃ ৭৪)

'যোগকথনম্' অধ্যায়ে হেম সরস্বতী যোগের পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং মহাজ্ঞানের মত ধর্মজ্ঞানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন যা আমরা মনসা মঙ্গল এবং গোরক্ষ বিজয়ে পেয়ে থাকি। এই 'যোগকথনম্' অধ্যায়ে আমরা চর্যাপদের প্রভাব দেখতে পাই। (লিটারেচার ইন কামতা কোচ রাজ দরবার, ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৪)

রাজা দুর্লভনারায়ণের সময়ের আর এক জন বিশিষ্ট কবির নাম হরিহর বিপ্র (অসমীয়াতে হরিবর বিপ্র) তিনি জৈমিনী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনি কৃত্তিবাসেরও পূর্ববর্তী। কবির লেখা 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধ' কবিত্বময় যুদ্ধ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। এই কাব্যে মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভজাত অর্জুন-পুত্র বভ্রুবাহনের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ বর্ণনা আছে। উক্ত কাব্যে কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা দুর্লভনারায়ণ সম্পর্কে বলেছেন - জয় জয় নরপতি দুর্লভনারায়ণ রাজা কামপুরে ভৈলা বীরবর।

সপুত্র বান্ধবে যেবে সুখে রাজ করন্তোক জীবন্তোক সহস্র বৎসর ।।

অযান রাজত খিত সাধুজন মনোনীত অশ্বমেধ স্কি বিরচিত সার ।
বিপ্র হরিবর কই গৌরীর চরণ সেই পদ বন্ধে করিলা প্রচার ।।

'লবকুশের যুদ্ধ' হরিহর বিপ্রের আর একখানি নাম করা গ্রন্থ । এখানেও কাহিনীর মূল বিষয় হল পিতা ও পুত্রের যুদ্ধ ।

দুর্লভনারায়ণের সমসাময়িক কবিরত্ন সরস্বতী ও মাধব কন্দলিকেও বৈষ্ণব ভাবধারার কবি বলা যায় । কবিরত্ন 'জয়দ্রথ বধ কাব্য' রচনা করেন । এইটিকে অনুবাদ ধারার অংশ রূপে গণ্য করা যায় । কবিরত্ন সরস্বতীর একখানি মহাভারতের দ্রোণ পর্বের অনুবাদ পাওয়া যায় । মাধব কন্দলি, রুদ্র কন্দলি ও সাহিত্য সাধনায় আত্ম নিয়োগ করেন । মাধব কন্দলি রামায়ণের অনুবাদে লিপ্ত হন ।

মানকর এবং দুর্গাবরের মনসা মঙ্গল ঐ সময়কার দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ, যাতে মৌলিকত্বের স্বাদ পাওয়া যায় । এখানে প্রচলিত কাহিনীর ভিন্ন রূপ আমাদের চোখে পড়ে । শিব এখানে কৃষ্ণের মত বাঁশী বাজাচ্ছেন, রাধার ন্যায় দুর্গাকে পাওয়ার জন্য নানা ভাব ভঙ্গি করছেন । (লিটারেচার ইন কামতা কোচ রাজ দরবার - ড. জেয় কুমার চক্রবর্তী - পৃ: ৫) এই দুই কবির রচনায় মিলও অনেক । দুর্গাবর রচিত রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড হতে উত্তরকাণ্ড পর্যন্ত পাওয়া যায় । ড: মহেশ্বর নেওগ কর্তৃক 'দুর্গাবরী রামায়ণ' নামে ১৯৫৪ সনে সম্পাদিত হয়ে সেটি প্রকাশিত হয়েছে । সেখানে তাঁকে অসমীয়া কবি বলে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে । তবে সম্প্রতি অধ্যাপক তরণীকান্ত ভট্টাচার্য 'দুর্গাবরী বাংলা রামায়ণ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ (সুবর্ণ লেখা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় -১৯৭৪, পৃ: ৬০২) প্রকাশ করে দুর্গাবর বিষয়ে আলোচনার নতুন দ্বার খুলে দিয়েছেন । তিনি কোচবিহার অঞ্চল থেকেই এই রামায়ণের অরণ্য কাণ্ডের (৩২ পত্রের) একটি পুথি সংগ্রহ করেছেন । ভণিতায় কবি নিজেকে দুর্গাবর দাস বলেছেন । কামরূপী দুর্গাবর এবং বাঙালী দুর্গাবর একই ব্যক্তি কিন্তু সে বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে । এ বিষয়ে ড: সুকুমার সেন বলেছেন 'দুই দুর্গাবর একই ব্যক্তি না হইতে পারেন । আসামে একদা দুর্গাবর নাম বহু প্রচলিত ছিল ।' (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০ পৃ: ২৩৯)

বিশ্বসিংহ — কামতা -কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহের রাজত্বকাল (১৫২২ -১৫৫৪) থেকে রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় পুরাণ অনুবাদ এবং সাহিত্যচর্চার প্রাধান্য দেখা যায় । এই সময় থেকেই কামতা- কামরূপে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় ।

বিশ্বসিংহের দুই পুত্র নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ বারানসীতে গিয়ে ব্রহ্মানন্দ বিশারদ নামক জৈনেক সন্ন্যাসীর আশ্রমে থেকে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁরা ব্যাকরণ, [illegible] সাহিত্য, জ্যোতিষ, শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায়, মীমাংসা এবং পুরাণ প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করে জ্ঞান লাভ করেন। দেশভাষা অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভে তাঁদের প্রভূত আগ্রহ' মিশ্র 'দরং রাজবংশাবলী' থেকে একটি উদ্ধৃতি দিলে বক্তব্যটি আরও পরিষ্কার হবে -

পিতৃর চরণ দুইভাই বন্দিলান্ত ।
পঢ়িবাক লাগি বারানসীক গৈলন্ত ।।
ব্রহ্মানন্দ সন্ন্যাসীক পাইলা দরিশন ।
সেহিস্থানে পঢ়িয়া রহিলা দুইজন ।। ২৬৬
সন্ন্যাসীও দায়াকরি দুয়জেকো রাখিলা ।
গুরুর বচনে দুয়ো শাস্ত্র অভ্যাসিলা ।।
ব্যাকর্ণ পুরাণ শ্রুতি স্মৃতি মীমাংসার ।
শিকিলন্ত তন্ত্র শাস্ত্র অথর্ব বেদর ।। ২৬৭
সমদম দায়া ভেদ ন্যায় নীতি যত ।
জ্যোতির্বেদ তর্ক শাস্ত্র শিকে নানা মত ।।
এক মনে পঢ়ে দুয়ো তাজি আন কাম ।
জপে সূর্যধ্বনি অকি বোলা রাম রাম ।। ২৬৮

(নবীন চন্দ্র শর্মা সম্পাদিত দরং রাজবংশাবলী, পৃ: ১০)

কোচবিহারের ইতিহাস থেকে জানতে পারি - বৈশাগ ধর্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁকে বিচার বিভাগের অধিপতি করা হয়েছিল। 'সার্বভৌম' উপাধিধারী জৈনেক পণ্ডিত, শ্রীধর নামক দৈবজ্ঞ এবং সুশিক্ষিত একজন বৈদ্য মহারাজ বিশ্বসিংহের রাজসভায় উপস্থিত থাকতেন। (কোচবিহারের ইতিহাস - আমানতউল্লা আহমদ, পৃ:১০)

মহারাজ বিশ্বসিংহের ধর্মানুরক্তি সম্পর্কে ঐ ইতিহাসে বলা হয়েছে -

' মহারাজ বিশ্বসিংহ শিব ও দুর্গার উপাসক ছিলেন এবং কালীচন্দ্র ভট্টাচার্য নামক জৈনেক ব্রাহ্মণের নিকট তিনি শাস্ত্রমত শৈব ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি কনৌজ, কাশী এবং অন্যান্য স্থান হইতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনয়ন এবং তাঁহাদিগকে স্বরাজ্যে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বাসুদেব আচার্যের পুত্র

ব্রাহ্মণকে শ্রীক্ষেত্র হইতে আনয়ন পূর্বক তাঁহাকে তিনি কামাখ্যাদেবীর সেবা পূজার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।' (কোচবিহারের ইতিহাস, আমানতউল্লা আহমদ। পৃঃ ৯২)

নরনারায়ণ— বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র নরনারায়ণ (১৫৩৩-১৫৮৭)। তিনি মিথিলা গৌড় প্রভৃতি স্থান থেকে ব্রাহ্মণপন্ডিতদের এনে কোচবিহারে সসম্মানে স্থান দিয়ে ছিলেন এবং প্রচুর ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করেছিলেন। তাঁর রাজসভা পন্ডিত মন্ডলীর দ্বারা সর্বদা সুশোভিত থাকত এবং তাঁর সময়ে দেশে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসার লাভ করেছিল। ভূষণদ্বিজ রাজকবি ছিলেন। রাজসভায় সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন হত এবং রাজকার্যে মূর্খ কর্মচারীর নিয়োগ নিষিদ্ধ হয়েছিল।' মহাপুরুষ শংকরদেব ও মাধবদেবর জীবন চরিত্র' (পৃঃ ১৬৮) গ্রন্থে দেখা যায় -

সংস্কৃত বিনে আন মাতন মাতয়।
সাধারন কথাকো সবে সংস্কৃত কয়।।

এই রাজার রাজত্বকালে পশ্চিম প্রদেশ থেকে এক দিগ্বিজয়ী পন্ডিত রাজধানীতে আগমন করেছিলেন এবং রাজসভার পন্ডিতগণের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত হয়ে ছিলেন। (কোচবিহারের ইতিহাস- আমানতউল্লা আহমদ- পৃঃ ১০০)
নরনারায়ণ গৌড় আক্রমণ করলে তাঁর ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বন্দী হন। মুক্তির পর তিনি সেখানে বিবাহ করেন, এবং সেখানে সেখান থেকে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ও পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধিমন্ডিত প্রসিদ্ধ পন্ডিতদ্বয়কে স্বদেশে আনয়ন করেন। পন্ডিত পুরুষোত্তমবিদ্যাবাগীশ রাজা এবং রাজমহিষী মহিষীর আদেশে ১৫৬৮ খৃঃ সংস্কৃত ভাষার বিখ্যাত ব্যাকরণ' প্রয়োগরত্নমালা' প্রনয়ন করেন। এ বিষয়ে' গন্ধর্বনারায়ণ বংশাবলী' তে লিখিত আছে -

' নৃপতির প্রিয়তমা ভানুপাটেশ্বরী।
ভট্টাচার্য আগে কথা কহিলা সাদরি।।
পাণিনির বর্ণক্রম গ্রন্থে নে দ্বি লিখিবা।
মহেশের কৃত কলাপের ক্রমদিবা।।

'প্রয়োগরত্নমালা' র ভূমিকায় লিখিত আছে -

শ্রীমল্লদেবস্য নৃপেক্ দ্বিথোর্মহীমহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্।
মল্লাং প্রয়োগোত্তম রত্নমালা বিতনতে শ্রী পুরুষোত্তমেন।।

(দ্র কোচবিহারের ইতিহাস, আমানতউল্লা দ্র আহমদ, পৃঃ ১০০ থেকে উদ্ধৃত)

কামরূপের পন্ডিত শ্রীকেশর ও জয়কৃষ্ণ 'প্রয়োগরত্নমালা'র পৃথক পৃথক টীকা প্রনয়ন করে গিয়েছেন। কথিত আছে যে নরনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে এই ব্যাকরণের সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। শ্রীধর দৈবজ্ঞ 'জ্যোতিষ' নামক নিবন্ধ ও কন্দল কায়স্থ 'ভূমি পরিমাণ' নামক গ্রন্থ রচনা এবং লীলাবতীর অনুবাদ করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি একখানা 'অঙ্কর পুথি' ও গদ্যে পদ্য রচনা করে ছিলেন। (কোচবিহারের ইতিহাস - আমানতউল্লা আহমদ - পৃঃ ১০১) ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' এর গ্রন্থ থেকে জানা যায়, শুক্লধ্বজ নিজে অথবা পন্ডিতকে দিয়ে 'গীত গোবিন্দের' টীকা রচনা করিয়েছিলেন। রাজার বিদ্বৎপ্রিয়তা সম্বন্ধে দুর্গাবর লিখিত বনপর্বে (বনপর্ব- দুর্গাবর, বরকটীক সংগৃহীত ও জোড়হাট থেকে প্রকাশিত) দেখা যায়:-

' ধর্ম নীতি পুরাণ ভারত শাস্ত্র যত।
অহোরাত্রি বিচারন্ত বসিয়া সভাত ।।
গৌড়ে কামরূপে যত পন্ডিত আছিল।
সবাক আনিয়া শাস্ত্র দেওয়ান পাতিল ।।'

রাজভ্রাতা শুক্লধ্বজ পুরাণ-প্রিয় ছিলেন, প্রধানত তাঁর আগ্রহে ও উৎসাহে কামতা-কামরূপের রাজ সভায় পুরাণ-কাহিনীর অনুবাদ শুরু হয়। যুবরাজ শুক্লধ্বজের সমকালীন পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের 'মার্কন্ডেয় পুরাণে' বলা হয়েছে -

একদিন সভামাঝে। বসি যুবরাজ।
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কাম ।।

* * * *

পুরাণাদি শাস্ত্রে যেহি রহস্য আছয়।
পন্ডিতে বুঝয় মাত্র অন্যে না বুঝয় ।।
এ কারণ শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজ দেশ ভাষাবন্দে রচিয়ো পয়ার ।।

বহুপূর্বে সূচিত এই অনুবাদ কার্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলেছিল। রাজসভায় পুরাণ- পাঠক ও কবিদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ ছিলেন ব্রাহ্মণ, তাঁর পিতা ভীমসেন। ডঃ সুকুমার সেনের মতে রামসরস্বতী অনিরুদ্ধেরই নামান্তর। কবিচন্দ্র নামধারী ব্যক্তি ও তাঁর মতে মতে অনিরুদ্ধ। প্রমাণস্বরূপ কবিচন্দ্র লিখিত মহাভারতের একটি পদে দেখা যায় -

পিতৃয়ে মাতৃয়ে অনিরুদ্ধ নাম থৈলা ।
কবিচন্দ্র নাম গোট দেবানে বুলিলা ।।
রামসরস্বতী নাম নৃপতি দিলন্ত ।
ভারতর পদ মোক করা বুলিলন্ত ।।

(শ্রী জীতেন্দ্র নাথ বসু রচিত উত্তর বঙ্গের সাহিত্যসেবা সম্বন্ধে দু' একটী কথা - পরিচারিকা, নবপর্য্যায়, ৫মবর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১০২৭ প্রবন্ধে উদ্ধৃত)

কিন্তু 'কোচবিহারের ইতিহাস' প্রণেতা আমানতউল্লা আহমদ অনিরুদ্ধ ও রাম সরস্বতীকে ভিন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করে লিখেছেন - ' পন্ডিত অনিরুদ্ধ এবং রাম সরস্বতী রাজার আদেশে রামায়ণ, মহাভারত এবং অষ্টাদশ পুরান/পর' পদ' (পদ্যে অনুবাদ) করিয়াছিলেন' (১০১ পৃষ্ঠা)

অনিরুদ্ধের রচনা সম্পর্কে ডঃ সেনের বক্তব্য উল্লেখ যোগ্য বিধায় এখানে উদ্ধৃত করা হলো ।' শুক্লধ্বজের অনুরোধে অনিরুদ্ধ 'ভারত পয়ার' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শুক্লধ্বজের সংগ্রহে যে সব মহাভারত পুথি ছিল তাহা তিনি বলদে বোঝাই করাইয়া কবির ঘরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহার সংসার যাত্রার সমস্ত ভার বহন করিয়া ছিলেন । প্রাচীন কালে হয়ত আরও অনেক রাজা যুবরাজ এমন মহৎ কাজ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহার আগে তাহার কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ মিলে নাই । বনপর্বের মধ্যে অনিরুদ্ধ এই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন -

জয় জয় নরনারায়ণ নৃপ সার ।
যার কীর্তি ব্যাপিলেক সমুদ্রের পার ।।
শুক্লধ্বজ অনুজ যাহার যুবরাজ ।
পরম গহন অতি অদ্ভুত কাজ ।।
তেঁহে মোক বুলিলন্ত মহাহর্ষ মনে ।
ভারত পয়ার তুমি কহিয়ো যতনে ।
আমার ঘরত আছে ভারত প্রশস্ত ।
নিয়োক আপন গৃহে দিলোহোঁ সমস্ত ।।
এহা বুলি রাজা পাছে বলধি যোড়াই ।
পঠাইল পুস্তক আমাসক ঠাই ।।
খাইবার সকল দ্রব্য দিলন্ত অপার ।
দাস দাসী দিলা নাম করাইলা আমার ।।

এতেক তাহান আজ্ঞা ধরিয়া শিরত ।
কৃষ্ণের যুগল পদ ধরি হৃদয়ত ।।
বিরচিলো পদ হৈতে অতি অনুপাম ।
পরম সুন্দর বনপর্ব যার নাম ।। (বনপর্ব, পুষ্পহরণ ভীষ্ম চরিত্র পৃঃ ২-৩)

অনিরুদ্ধ প্রথমে বনপর্ব, উদ্যোগপর্ব, ভীষ্মপর্বের আখ্যান বাংলায় রূপান্তরিত করিয়া ছিলেন। তাহার পরে শুক্লধ্বজ কৃত 'গীত গোবিন্দের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জয়দেব' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটিতে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার পট ভূমিকায় গীত গোবিন্দ পদাবলীকে বর্ণনাময় রূপ দেয়া হইয়াছে। কাব্যের আরম্ভে রামসরস্বতী নিজের রচনার তালিকা দিয়াছেন -

পূর্বেত রচিলো পদ অতি অনুপম ।
উদ্যোগর আদ্যকথা ভাগবত নাম ।।
ভীষ্ম পর্ব নিবন্ধিলোঁ ভীষ্মের নির্বাণ ।
পাছে মোর যাত্রা বনপর্ব যার নাম ।।
জয়দেব নামে কাব্য বিরচিলো সার ।
শুক্লধ্বজ রাজা টীকা করিলন্ত যার ।।
নরনারায়ণ নন্দ প্রতি প্রাণ ভাই ।
মহারাজা শুক্লধ্বজ যার সম নাই ।।
তাহান টীকাক জিজ্ঞাসিয়ো বুধ জনে ।
যদি অর্থ না পাবা নিন্দিবা মোক মনে ।।

অনিরুদ্ধের 'ভারত-পাচালী' প্রধানত বর্ণনামূলক। তবে মাঝে মাঝে দুই একটি পদ আছে। বনপর্ব হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। পদটিতে অ অকৃত্রিম ভক্তিরসের পরিচয় আছে -

নমো নন্দ সুত তনু মেঘ সম শ্যাম ।
গলে বনমালা পীতবস্ত্র অনুপাম ।।
কর্ণিপুচ্ছের খোপা হাতত পাঁচনি ।
গোপর বালক সনে করে বংশীধ্বনি ।।
হেনয় কৃষ্ণক দুই অরুণ চরণে ।
মোর মন ভ্রমরে রহুক সর্বক্ষণে ।।
তুমি প্রভু পতিত জনর নিজ গতি ।
কাকুতি করিয়া মাগোঁ রামসরস্বতী ।।'

(বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, ড: সুকুমার সেন)

ডঃ অজয়কুমার চক্রবর্তী তাঁর 'লিটারেচার ইন কামতা কোচ রাজ দরবার' (পৃঃ৬৮)গ্রন্থে রামসরস্বতী রচিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন, যথা - বনপর্ব, ভীষ্মপর্ব, বিরাট পর্ব, উদ্যোগ পর্ব, অশ্বমেধ পর্ব, নারী পর্ব, ভীম চরিত, সাবিত্রী চরিত, জঙ্ঘাসুর বধ, মণি চন্দ্র ঘোষ। এ থেকে বোঝা যায় রামসরস্বতী অনুবাদ কার্যে অত্যন্ত দক্ষ ও নিরলস ছিলেন। অনিরুদ্ধ পুত্র পাঠক গোপীনাথ দ্রোণ পর্ব অনুবাদ করেছিলেন।

মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্ব কালে সার্বভৌম ভট্টাচার্য 'ভবিষ্য পুরাণের' অনুবাদ করেন। কল্যাণ মিশ্র নামে এক কবি 'ভাগবত পুরাণের' চতুর্থ ও ষষ্ঠ সর্গের অনুবাদ করেছিলেন বলে জানা যায়। এ ছাড়াও ডঃ সুরঞ্জন দত্ত রায় তাঁর 'কামতা-কোচ রাজ সভার সংস্কৃতি সাহিত্য' (শারদীয় জনমত ১৩৮২, পৃ: ২৩) প্রবন্ধে লিখেছেন 'কীর্তনের ভণিতে এই সময় রামায়ণ কাহিনীর পরিবেশনে কল্যাণ চন্দ্র মিশ্র নামক একজন কবির নাম পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থটির নাম রামায়ণ চন্দ্রিকা।' ইনি এবং পূর্বোক্ত 'ভাগবত পুরাণ' অনুবাদকর্তা কল্যাণ মিশ্র একই ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তীর মতে নরনারায়ণের সময়ে রচিত কবীন্দ্র পরমেশ্বরের একখানি মহাভারতের সন্ধান পাওয়া যায়। তার একটি ভণিতা -

পুন সভাসদ পদ ভারতের কাহিনী।
কবীন্দ্র রচিল ভক্তি বোল রাম বানী।।

ওই ভণিতায় অবশ্য 'পরমেশ্বরের' উল্লেখ নেই। কবীন্দ্র উপাধিটিও নানা সময়ে নানা কবির উপর প্রযুক্ত হয়েছে। শুধুমাত্র 'কবীন্দ্র' উল্লেখ থেকে এঁকে বাংলা সাহিত্যের আদি মহাভারত অনুবাদক কবীন্দ্র ~~xxx~~ পরমেশ্বরের সঙ্গে মিলানো যাবে না আরো প্রমাণ ছাড়া।

কংসারিও এই সময়ে মহাভারতের বিরাট পর্ব এবং কিরাত পর্বের কিছু অংশ অনুবাদ করেছিলেন। (লিটারেচার ইন কামতা কোচ রাজ দরবার, ডঃ অজয় কুমার চক্রবর্তী, পৃঃ ৬৯)

' পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ 'জগদ্গুরু' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা তাঁহাকে রাজসভার ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি 'কৌমুদী' নাম দিয়া অনেকগুলি স্মৃতি নিবন্ধ গ্রন্থ রচনা এবং সংস্কৃত ভাষার বহু গ্রন্থের ব্যানুবাদ করিয়াছিলেন। শ্রী যুক্ত গোপাল চন্দ্র তর্কস্মৃতি ব্যাকরণ তীর্থ নামক কামরূপ জেলা নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু গবেষণা এবং পরিশ্রমের ফলে সিদ্ধান্তবাগীশের প্রণীত 'কৌমুদী' নিবন্ধাবলীর মধ্যে 'প্রেত কৌমুদী এবং 'সংক্রান্তি কৌমুদী' নামক দুইখানি গ্রন্থ সুরচিত টীকার সহিত সম্প্রতি মুদ্রাপিত এবং

প্রকাশিত করিয়াছেন ।' (কোচবিহারের ইতিহাস , আমানতউল্লা আহমদ , পৃঃ ১০১) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য , উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পীতাম্বরের 'প্রত কৌমুদী' পুঁথি (১১৪ নং) সংরক্ষিত আছে ।

আমানত উল্লা আহমদ পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ এবং এবং পীতাম্বর দাসকে এক ব্যক্তি" মনে করেছেন এবং ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন । এ বিষয়ে পরবর্তী গবেষণায় ভিন্ন মত দেখা যায় । পীতাম্বর তাঁর কাব্যে কোথাও নিজেকে সিদ্ধান্তবাগীশ বলেন নি ।

ডঃ সুকুমার সেনই সর্বপ্রথম পীতাম্বরকে অব্রাহ্মণ বলে উল্লেখ করেন । তিনি রংপুর জেলা থেকে পীতাম্বর রচিত নলদময়ন্তীর উপাখ্যানের যে পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকে একটি শ্লোক উদ্ধার করে দেখিয়েছেন , পীতাম্বর নিজেকে' দাস পীতাম্বর' বলে অভিহিত করেছেন । (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস , ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ , পৃঃ ২৬১) ডঃ সেন কর্তৃক উদ্ধৃত পীতাম্বরের'নলদময়ন্তী' উপাখ্যান থেকে একটি শ্লোকে জানা যায় -

দময়ন্তী চরিত্র যেবা শুনে নিত্য

অপদ খণ্ডে ততক্ষণে ।

বহুত সম্প্রতি হরিপদে গতি

দাস পীতাম্বরে ভণে ।।

এখানে'দাস' শব্দটাকে পীতাম্বরের লৌকিক উপাধি বলে গ্রহণ করে পীতাম্বরকে অব্রাহ্মণ বলা হয়েছে । এ বিষয়ে আরও প্রমানাদি আছে । তিনি মনে প্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন । ভাগবত দশমস্কন্ধের অনুবাদে তিনি যেখানেই অবকাশ পেয়েছেন সেখানেই হরিপদে স্বীয় অন্তরের অর্ঘ নিবেদন করেছেন । পীতাম্বর মহারাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা সমর সিংহের (চিলারায় , শুক্লধ্বজ) আদেশে এই অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করে ছিলেন । উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে পীতাম্বর কৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের একখানি অসম্পূর্ণ পুঁথি (পুঁথি নং ৫৮)রক্ষিত আছে । অ উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ একখানি পুঁথি সংরক্ষিত আছে ।ভাগবত চর্চার মধ্যমণি পীতাম্বর বিষয়ে ডঃ বিমলেন্দু দাম বলেছেন - ' অনুবাদ মূলানুগ ও তথ্যনিষ্ঠ ।কিন্তু তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা কোথাও নিতান্ত তথ্যসর্বস্ব হইয়া উঠে নাই । মূলের প্রতি আনুগত্য রক্ষিত হইলেও উহাকে ঠিক মূলের আক্ষরিক অনুবাদ বলা চলে না'।

'পীতাম্বর সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য কথাকে বাংলায় রূপান্তরিত করিলেও তাঁহার ভাষা কোথাও সংস্কৃত পন্থী নহে । সর্বজন বোধ্য সহজ সরল দেশজ ভাষায় তিনি

তাঁহার কাব্য রচনা করিয়া সংস্কৃত অনভিজ্ঞ সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বক্তব্যের সরলতা, বর্ণনার সাবলীলতা ও ভাষার প্রাঞ্জলতা এই তিনটি গুণ তাঁহার কাব্যকে এক অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।' (ব্র গোবিন্দ বিজয় ঃ কোচবিহার রাজসভার কবি পীতাম্বর কৃত ভাগবত দশম স্কন্ধের অনুবাদ, বিমলেন্দু দাম, উত্তরবঙ্গ বিশ্ব - বিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি উপাধির গবেষণা গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত, ১৯৭২)

নিম্নে ডঃ দাম সম্পাদিত অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ থেকে কবির বীররসাত্মক একটি বর্ণনা তুলে ধরছি -

বজ্রসার ধনু তিন তাল পরমান।
দেখি বাম করে তুলি লৈলা ভগবান।।
গুণ দিতা লিলায়ে টানীল কোদন্ড।
মাবাত ভাঙ্গিয়া ধনু হৈল দুই খন্ড।।
জেন ইক্ষুবন গজে ভাঙ্গে লিলা করী।
সেহিমতে ধনুখান ভাঙ্গিল শ্রীহরি।।
ধনুক ভাঙ্গিতে সব্দ হৈল অতিসয়।
সে শবদে কাম্পিল সকল দিগচয়।।

পীতাম্বরের একটি ভণিতা -

প্রচন্ড প্রতাপ বিশ্বসিংহ নররায়।
দানে হরীশ্চন্দ্র ভোগে পুরন্দর প্রায়।।
কুমার সমর সিংহ আজ্ঞা পরমানে।
কৃষ্ণ কেলি সুপয়ার পিতাম্বরে ভণে।।

কবি এই কাব্যে পয়ার, লঘু ত্রিপদী, দীর্ঘ ত্রিপদী ও একাবলী ছন্দ ব্যবহার করেছেন।

'ঊষা পরিণয়' কাব্যে পীতাম্বর নিজেকে কামরূপ বাসী বলে উল্লেখ করেছেন। একটি ভণিতা থেকে তা আরও পরিস্কার ভাবে অনুধাবন করা যাবে -

কামতা নগরে সুরপুরি পরতেক।
তাতে সিসু পিতাম্বর নামে কবি এক।।

কবি পীতাম্বর তাঁর 'ঊষা পরিণয়' কাব্যখানি ভাগবত ও বিষ্ণু পুরাণের কাহিনী সমন্বয়ে নতুন ভাবের আবেগে রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি ডঃ মহেশ্বর নেওগের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তর বঙ্গের কোন গ্রন্থাগারে পীতাম্বরের 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' সংরক্ষিত

আছে (পুথি নং ৮, পাটা দুটি চিত্রিত, পত্র পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫ ১-১১৬, সম্পূর্ণ) বেণীর ভণ ভণিতায়তে কুমার সমর সিংহের আজ্ঞায় এই মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচনা কাজে তিনি মনোনিবেশ করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

মহারাজ বিশ্বসিংহ কামতা নগরে।
তার পুত্র ভোগে তুল্য নহে পুরন্দরে ।।
গুণালয় সদয় হৃদয় অনুক্ষণ।
সর্ব্বদায় চিত্তে চিন্তে ভবানী চরণ ।।
একদিন সভামাজে বসী যুবরাজ।
মনে আলোচিয়া হেন কহিলন্ত কাজ ।।
শুন সভাসদ জন আমার মনত।
আকুল হইছে উপস্থিত জেন মত ।।
সেকথা তোমাত আমি করি উদীরণ।
না করিব হেলা কথা শুন এমন ।।
পুরাণাদি শাস্ত্রে জেহি রহস্য আছয়।
পন্ডিতে বুজয় মাত্র অন্যে না বুঝয় ।।
এ কারণে শ্লোক ভাঙ্গি সবে বুঝিবার।
নিজ দেশ ভাষাবন্দে রচিয়ো পয়ার ।।

আর একটি ভণিতায় বলা হয়েছে -

কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর।
প্রচন্ড প্রতাপে রাজা ভোগে পুরন্দর ।।
তাহার তনয় সর্ব্বগুণে রত্নাকর।
মহা মহোত্তর দানে কর্ণ সমসর ।।
কুমার সমর সিংহ আজ্ঞা পরমানে।
কহে পিতাম্বর নারায়ণ পরমানে ।।

আবার বিশ্বসিংহের আজ্ঞায় এই মার্কণ্ডেয় পুরাণ লেখা হচ্ছে বলেও ভণিতা আছে, যেমন -

কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বরে।
প্রচন্ড প্রতাপ রাজা ভোগে পুরন্দরে ।।

মহাপ্রভু কথা তার আজ্ঞাপরমানে ।
পয়াড় প্রবন্ধে পিশু পিতাম্বরে ভণে ।।

এই মার্কণ্ডেয় পুরাণে চণ্ডীকে দু একবার গোসানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে যেমন দেখাযায় ১০৫-২ পৃষ্ঠায় 'শম্ভু দৈত্যকে' গোসানী মারিয়া পেলিলন্ত মহাপথ' ।

নরনারায়ণের সভাসদ কবি অনন্ত কন্দলী রচিত মহাভারতের 'রাজসূয়' পর্ব বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত কবির পুথি (১০২ নং)থেকে নমুনা উদ্ধৃতি তুলে ধরছি -

রাজসুই জজ্ঞ করিবেক যুধিষ্ঠির ।
বিলম্ব না করি আসিবাহা সবে বির ।।
পৃথিবির জত রাজা সমস্তে আসিব ।
যুধিষ্ঠির অধিরাজ পদবি সাধিব ।।

পুথির আকার ১৫ ½ X৫ ইঞ্চি পত্র সংখ্যা ২-৪৩ , অসম্পূর্ণ ।রচনা কালের কোন উল্লেখ নেই বা নির্দ্দিষ্ট রাজার নাম নেই, তবে রাজ সভার ও বর্ণনা আছে ।

অনন্ত কন্দলী এ ছাড়াও জয়দেবের গীতগোবিন্দ অনুবাদ করেন এবং মহাভারতের সাবিত্রী উপাখ্যান রচনা করেন । কবি মনে প্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন , তার প্রমাণ আমরা ভণিতাগুলিতেই পেয়ে থাকি । তিনি গীতার অনুবাদ করেছিলেন । তাঁর রচিত 'বৈষ্ণবামৃত' নামক তার একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থের নামও পাওয়া যায় । অনন্ত কন্দলী গ্রাম্য কীর্তন রচনা করেন ।

অনন্ত কন্দলী অনূদিত ভাগবতের দশম স্কন্ধ তার একটি উল্লেখ যোগ্য সংযোজন ।' অনন্ত কন্দলী কামরূপ অন্তর্গত হাজো নিবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার পিতার নাম রত্ন পাঠক । তাঁহার প্রকৃত নাম হরিচরণ । অনন্ত কন্দলী তাঁহার উপাধিমাত্র । তিনি চন্দ্র ভারতী বা ভাগবত আচার্য উপাধিতেও ভূষিত ছিলেন । অনন্ত কন্দলী শঙ্করদেবের শিষ্য ছিলেন , শঙ্করদেব কৃত ভাগবতের দশম স্কন্ধের অসম্পূর্ণ অংশ (মধ্য দশম ও শেষ দশম) অনন্ত কন্দলীই সমাপ্ত করেন । তাঁহার রচনায় তাই শঙ্কর দেবের রচনার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায় । অনন্ত কন্দলী কেবল মাত্র ভাগবত হইতেই ঘটনাবস্তু আহরণ করেন নাই , হরিবংশ হইতেও তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে ।' (ডঃ বিমলেন্দু দাম কৃত - গোবিন্দ বিজয় - কোচবিহার রাজসভার কবি পীতাম্বর কৃত ভাগবতের দশমস্কন্ধের অনুবাদ। পৃঃ ৭) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনন্ত কন্দলী লিখিত ভাগবত (পুথিনং ১২১৫) রক্ষিত আছে । খণ্ডিত তুলট পত্রে এই পুথি লেখা ।

শঙ্করদেব মহারাজা নরনারায়ণের আশ্রয়ে থেকে কৃষ্ণ নাম প্রচার করতেন। তিনি সীতা স্বয়ংবর নাটক, কৃষ্ণগুণ মালা, শ্রীমদ্ ভাগবতের পদ পদ্যানুবাদ, গোপী উদ্ধব সংবাদ, ভক্তি প্রদীপ প্রভৃতি অনেকগুলি বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রনয়ন করেন। অনেক গ্রন্থে মহারাজা নরনারায়ণের গুণকীর্তন আছে। আসাম সাহিত্য সভা শঙ্করদেব বিরচিত অন্যূন ত্রিশখানা গ্রন্থ আবিষ্কার করেছেন। মহাপুরুষীয়া শঙ্করদেবের আবির্ভাবে সাহিত্যে নতুন ধারা বইতে থাকে। তিনি নিজে এবং শিষ্যদের মাধ্যমে স্থানীয় ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ অনুবাদ করেন। শঙ্করদেবের শিষ্য মাধবদেবের নাম এ বিষয়ে উল্লেখ যোগ্য। তিনি 'গুণ্ঠমণি' নামে মনস্তত্ত্বের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীধর কন্দলী 'কন খোয়া' নামে শ্রীকৃষ্ণের উপর একটি গ্রন্থ রচনা করেন। শঙ্করদেবের শিষ্য ভূষণ দ্বিজ রাজকবি ছিলেন (কোচবিহারের ইতিহাস- পৃঃ ১০০) তিনি 'গুরুচরিত' নামে একটি চরিত গ্রন্থ এই সময়ে রচনা করেন। দামোদর দেবের শিষ্য রামরায় দামোদর দেবের জীবন কথা নিয়ে গুরুলীলা রচনা করেন। নরনারায়ণের রাজত্বকালে বৈষ্ণবসাহিত্য বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ হয়। এই সাহিত্যের প্রধান সুর ছিল ভক্তিবাদের সুর। এই সময়ে বিদুষী মহারাণী ভানুমতী স্বামীর পাশে পাশে থেকে অনেক কবিকে নানা সাহিত্য রচনায় উৎসাহিত করেছেন। সাহিত্য অনুরাগী রাণী বলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে বলে মনে করি।

'মহারাজবংশাবলী'তে লিখিত আছে যে' 'এপর মহারাজার (নরনারায়ণ) কৃত মল্লদেবী নামে অভিধান প্রকাশ করে। ঐ পুরুষোত্তম ব্রাহ্মণ স্বরায় তপস্যা করায় আত্মনগরস্থ আবাল যুবা বৃদ্ধ ইতর স্ত্রী পুরুষের মুখে দৈব ভাষা প্রদান করার অদ্যাপি ঐ গ্রন্থ চলিত আছে'। (রিপুঞ্জয় দাস ও অন্যান্য বিরচিত মহারাজবংশাবলী, নৃপেন্দ্র নাথ পাল সম্পাদিত, পৃঃ ৪) কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে আর কোথাও কোন উল্লেখ নেই এবং উক্ত মল্লদেবী অভিধান গ্রন্থটিও দুষ্প্রাপ্য।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাচীনতম দলিল হিসেবে কোচবিহার রাজদরবার থেকে লিখিত পত্রখানির গুরুত্ব অসাধারণ। মহারাজা নরনারায়ণ ১৫৫৫ খৃঃ অহোম রাজের নিকট বাংলা গদ্যে লেখা ঐ উল্লেখ্য পত্রখানি পাঠিয়েছিলেন। তার অংশ বিশেষ তুলে ধরছি -

'লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি। তোমারো এ গোট কর্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপন জান। অধিক কি কে

লেখিয়। সতানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দ্দার উভয় চাউনিয়া শাময়রাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘু ঘুড়ি ২ খান ১ চোমাংস ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ (১)সারি ৫ থান এই সকল দিয়া পঠইছে। তার সমাচার বুঝি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ পোঠাচে ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণ চামর ২০ শুক্ল চামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়'। (কোচবিহারের ইতিহাস পৃ: ১০৪ থেকে সংকলিত)

ড: অজয় কুমার চক্রবর্তীর মতে, কেবল মাত্র চিঠিই নয়, সাধারণ কাহিনী বিন্যাসেও গদ্য ব্যবহারের পথ প্রদর্শক হল এই দরবার। কবি মাধবদেব কৃষ্ণ ভক্তিবাদ গদ্যে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। ড: চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে মাধবদেবের রচিত গদ্যাংশ উধৃতও করেছেন। তবে ঐ রচনার উৎস সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে কিছু জানাননি।

মহারাজা নরনারায়ণ শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্তহয়ে সময়ে সময়ে পন্ডিতগণের সহিত প্রতিযোগিতা করতেন। লোকে তাঁকে ধর্মরাজ বলত। তাঁর চরিত্র এবং বিদ্যাবুদ্ধির সুখ্যাতি তৎকালীন দিল্লী দরবারেও আলোচিত হয়েছিল। এই বিদ্যোৎসাহিতার জন্য তাঁকে 'কামরূপের বিক্রমাদিত্য' বলা হতো। (কোচবিহারের ইতিহাস - পৃ: ১০২)

লক্ষ্মীনারায়ণ—লক্ষ্মীনারায়ণ (১৫৮৭-১৬২৭) নরনারায়ণের মৃত্যুর পর কোচবিহারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে শঙ্কর শিষ্য দুই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারক মাধবদেব এবং দামোদরদেব কোচবিহারে বাস করতেন। তাঁরা রাজার নির্দেশে ও উৎসাহে অনেকগুলি ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। দামোদরদেব কেবল মাত্র বড়গীত রচনা করেছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের সময়ে গোবিন্দ মিশ্র 'শ্রীভগবদ গীতা' অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। বর্তমানে কোচবিহার সাহিত্য সভায় তার একটি পুথি রক্ষিত আছে। রচনার নমুনা -

কুরু পান্ডবর   মনেক কালের

যুদ্ধর প্রারম্ভ কালে।

সম্মুখ সংগ্রামে   রথ বহাইলা

উভয় সেনার মাঝে।। (বাংলা পুথি পরিচয়, ড: সুবোধরঞ্জন রায় পুথি নং ১৮)

'কোচবিহারের ইতিহাস' মতে (পৃ:১৫২)'মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের আদেশে সিদ্ধান্ত বাগীশ ১৫৩৮ শকে (১৬১৬ খৃ:) শিবরাত্রি কৌমুদী, মঞ্জদীপা কৌমুদী, সংক্রান্তি কৌমুদী, একাদশী কৌমুদী এবং গ্রহণ কৌমুদী সংকলন করিয়াছিলেন।'

78293
7 JUN 1992

'রাজম-ত্রী বিরূপাক্ষ কার্যীর অনুরোধে মাধবদেব'নাম মালিকা' গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম গজপতি কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় সংকলিত হইয়াছিল এবং শঙ্করদেব তাহা আনয়ন করিয়াছিলেন। মাধবদেবের বিরচিত ভক্তিরত্নাবলী, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রহস্য এবং (রামায়ণের) আদিকাণ্ড পুথি কোচবিহারের রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে।' (কোচবিহারের ইতিহাস পৃ: ১৫২)

ড: সুকুমার সেনের মতে মহাভারতের বিরাটপর্ব অনুবাদ করেছিলেন নরনারায়ণ পুত্র কামতার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সভাকবি বিশারদ চক্রবর্তী। তাঁর রচিত বনপর্বের অনুবাদের পুথির সন্ধানও মিলেছিল। (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম ১ম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ: ২৭৫) বিশারদের বিরাট পর্বের রচনাকাল ১৫৩৪ শক (১৬১০ খৃ:)। এই গ্রন্থের একটি ভণিতা -

রত্নপীঠ লক্ষ্মীনারায়ণ নৃপবর।
বিহার কামতা নাম তাহার নগর।।
বিজ্ঞ বিপ্র এক সেহি নগরত বাস।
বিশারদ চক্রবর্তী রচে উপন্যাস।।
বিরাট পর্ব সেহি কৈল লোকরসে।
বেদ বহ্নি বান চন্দ্র শাকে চৈত্র মাসে।।
বিরাট পর্বের কথা শ্রবণ রমন।
বুঝি অনুসারে তাক করিব রচন।।
বেদবহ্নি বানচন্দ্র শাকের প্রমানে।
চৈত্র গুরু দিনে পদ বিশারদে ভনে।।

এ ছাড়া বিপ্র বিশারদের কর্ণ পর্ব অনুবাদের তথ্যও পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্বোক্ত বিরাট পর্ব ছাড়া আর কোন পুথির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

বীরনারায়ণ— লক্ষ্মীনারায়ণের পর বীরনারায়ণ (১৬২৭-১৬৩২) রাজা হন। জয়নাথ মুন্সী লিখিত' রাজোপাখ্যান' গ্রন্থে (পৃ: ২৪) লিখিত আছে যে ঃ বীরনারায়ণের প্রথম আমলে এক ব্রাহ্মণ দিগ্বিজয়ী ভট্টাচার্য নারায়ণ ত্রৈলোক্য দর্শী উপাধিধারী রাজদ্বারে এসে দ্বারীদিগের সঙ্গে কথাবার্তায় অশুদ্ধ অক্ষর ভাষার প্রয়োগ শুনে পণ্ডিত এবং রাজা লজ্জিত হয়ে ছিলেন। পরে রাজা স্থানে স্থানে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা নির্মান করে ব্রাহ্মণ বালক সকল ও রাজপুত্র প্রাণ নারায়ণ ও মন্ত্রীপুত্রদিগের ও ভৃত্যদের পুত্র ও স্বারি পুত্রদেরও শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। রাজা সর্বদা তাদের অধ্যয়নে অগ্রগতির সংবাদ নিতেন। এতে সকলেই পণ্ডিত হয়ে উঠতে লাগলো।

বীরনারায়ণের আদেশে কবিশেখর নামক এক ব্রাহ্মণ মহাভারতের কিছু কিছু অধ্যায়ের অনুবাদ করেছিলেন। কোচবিহার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে তাঁর একখানি পুঁথি রক্ষিত আছে। ডঃ নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর রচিত পুঁথি তালিকায় (১০ নং পুঁথি) কবিশেখরের মহা পুঁথিকে মহাভারতের কিরাত পর্ব বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ পুঁথির ভণিতায় কিরাত পর্ব বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। পুঁথি পাঠে মনে হয় এই অংশটুকু বনপর্ব অংশের ঘোষ যাত্রা অধ্যায়। এখানে চিত্রসেনের সঙ্গে দুর্যোধনের যুদ্ধের বর্ণনা আছে।

পুঁথি থেকে একটি ভণিতা তুলে ধরছি -

বিরনারায়ণ নৃপ রসিক সুজান।
ভুবন মোহন রূপ জেন পঞ্চানন।।
তার আজ্ঞা পরমানে অরথ অরথি।
বোলে রামকৃষ্ণ কবিশেখর বদতি।। ২৮-৮

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে কবির নাম রামকৃষ্ণ কবিশেখর বলেছেন। কবি ভণিতায় 'রামকৃষ্ণ' এবং 'গোবিন্দ' বহুবার ব্যবহার করেছেন। উক্ত পর্বের লেখক আমাদের কাছে কবিশেখর নামেই পরিচিত।

এই অধ্যায়ে কোচবিহারের বিদ্যোৎসাহী রাজবংশের সূত্র থেকে মহারাজা বীরনারায়ণের রাজত্বকাল অবধি সময়ের চিত্র তুলে ধরলাম, যাথেকে প্রমাণিত হবে বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা ও উন্নতিতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা সেখানে কত ব্যাপক ও গভীর ভাবে সক্রিয় ছিল। এই পৃষ্ঠপোষকতার প্রবাহ অব্যাহত ছিল রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তাঁর পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকাল অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। কিন্তু এর বিশেষ স্ফূর্তি লক্ষ্য করা গেল বীরনারায়ণের পুত্র রাজা প্রাণ নারায়ণের রাজত্ব কালে (১৬৩২ - ১৬৬৫)। তাঁর সময়েই আমাদের বিশেষ আলোচ্য কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের আবির্ভাব। পরবর্তী অধ্যায়ে পৃষ্ঠপোষক রাজা প্রাণনারায়ণ এবং পৃষ্ঠপোষিত কবি শ্রীনাথের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হ যাবে।